৭. মুখের মধ্যে সারস

লোককথা

পড়ুয়ারা পাঠটি শুনে এবং পড়ে নিজের ভাষায় সেটা লিখতে পারবে এবং পড়ে শোনাতে পারবে, সেই বিষয়ে 'কেন' এবং 'কী করে' প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

এটি একটি লোককথা। লোকের মুখে মুখে যে-কথা বা গল্প চলে আসছে, তাকে বলে লোককথা। এইসব গল্প কার মাথা থেকে প্রথম বেরিয়েছিল, কে কাকে প্রথম শুনিয়েছিলেন, আজ সে-কথা জানার আর কোনো উপায় নেই। কেবল এইটুকু আমরা বুঝতে পারি, যখন মানুষ লিখতে শেখেনি তখন থেকেই এইসব গল্প মানুষের খুব প্রিয় ছিল। একজনের মুখ থেকে আর একজন, তাঁর কাছ থেকে আর একজন — এমনি করে বহু পুরানো কাল থেকে তা আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। কথায় বলে গুজবের ডালপালা গজায়। কেন বলে? এই গল্পটি পড়লেই বুঝতে পারবে।

গল্পটি শুরু করার আগে পড়ুয়াদের নিয়ে একটা খেলা খেলুন। আপনি 'চাইনিস হুইসপার' নামক খেলাটির কথা নিশ্চয় জানেন। পড়ুয়াদের সবাইকে বাগানে নিয়ে যান। সবাইকে গোল করে বসান। এবার এদের মধ্যে থেকে একজনের কানে কানে একটি লম্বা বাক্য বলুন। এবার, তাকে বলুন সে যেন তার পাশের জনের কানে কানে সেই একই কথা বলে। এরকম করতে করতে যখন একেবারে শেষের পড়ুয়ার কাছে কথাটি আসবে, সে যেন উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাটা জোরে জোরে সবাইকে বলে শোনায়। এরকম দু-তিনবার করুন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল, প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন, তার সাথে খেলার শেষে পাওয়া কথাটি খানিকটা ভিন্ন হবে। এবার গল্পটি পড়ুয়াদের শোনান।

বাড়ি ফেরার সময় এক পণ্ডিত মাঠ পেরোলেন। হঠাৎ কাশি এল। মাটিতে থুতু ফেললেন। অবাক হয়ে দেখেন, কফের মধ্যে একটা সারসের পালক।

কী হল কিছুই বুঝে পান না। চিন্তাও হল খুব। ভাবছেন আর ভাবছেন। বাড়ি ফিরেই বউকে ডেকেছেন। বলছেন, 'ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কাউকে বলা দরকার, তাই তোমায় বলছি। তবে প্রতিজ্ঞা করো, একথা কারুক্কে বলবে না।'

—দিব্যি কেড়ে বলছি, কারুক্কে বলব না।

তখন পণ্ডিত বউকে বললেন ঘটনার কথা। বউ তো কথাটি অন্যকে না বলে পারছে না। তার মনেও দুশ্চিন্তা। তাই যেই দেখেছে এক পড়শিকে, বলে ফেলল, 'একটা কথা মন থেকে যাচ্ছে না ভাই! কথা দে কারুক্কে বলবি না। আমিও আমার সোয়ামিকে কথা দিইছি, কারুক্কে বলব না।'

পড়শি বলছে, 'সে আর বলতে। জানিস তো আমার পেট থেকে কথা বেরোয় না। কারুক্কে বলব না। কী কথা ভাই?'

—বলবি না তো?

—অতই যদি অবিশ্বাস, বলিস নি। কবে তোর কোন গোপন কথা কাকে বলিছি বল?

—ঠিক আছে বোন, বলছি। তুই আমার কত ভালো বন্ধু, সে কি জানি না! শোন, আমার সোয়ামি যখন মাঠ দিয়ে ঘরে ফিরছিল, থুতু ফেলেছে। থুতুতে কী বেরোল জানিস? খালি সারসের পালক বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই—এত এত! তাই চিন্তায় পড়েছি ভাই। কী যে হল ওর।

—নে, এই নিয়ে অত ভাবিস না। এমন সব বিপদ ঘটেও, কেটেও যায়। তবে কারুক্কে না বলাই ভালো। নানা গুজব ছড়াবে।

কিন্তু আর একজনকে বলতে না পারলে পড়শিরও পেট ফাটছে। যেই এক বন্ধুর দেখা পেয়েছে অমনি বলছে, 'কারুক্কে ব'লো না ভাই। পণ্ডিতের বউকে কথা দিইছি, একথা ফাঁস করব না। জানো আজ কী হয়েছে? পণ্ডিত মাঠের মধ্যে একটা গোটা সারস উগরে ফেলেছে। আমি জানতাম পণ্ডিতরা মাছ মাংস খায় না। কিন্তু কে সত্যি কথা জানবে বলো?'

—একটা গোটা সারস! সে যে পেল্লায় পাখি গো! খেলো কী করে? আশ্চর্য মানুষ বটে! তবে ভেবো না। আমি এ কথা কারুক্কে বলব না।

এর পরেই আরেক পড়শি শুনল, পণ্ডিতের মুখ থেকে ফরফরিয়ে ডানা ঝাপ্‌টে একঝাঁক সারস বেরিয়েছে, উড়েও গেছে।

দিন শেষ হবার আগে সেখানে সবাই জেনে গেল, পণ্ডিতের মুখ থেকে বড়ো বড়ো পাখি, যেমন সারস, বক ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়েছে আর উড়ে গেছে।

আশপাশের গ্রামেও গুজব ছড়াল। সেসব গ্রামের মানুষরা গাড়িতে বলদ যুতে হাঁকিয়ে চলে এল পণ্ডিতের গ্রামে এ অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে। হয়তো এ কোনো অলৌকিক ঘটনাই হবে। শোনা যাচ্ছে নানা রঙের, নানা আকারের, দূরদূরান্তেরও পাখির ঝাঁক পণ্ডিতের মুখ থেকে বেরোচ্ছে আর

উড়ছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে না, এত পাখি!

বেচারি পণ্ডিত পাগল হবার উপক্রম। ঘর ছেড়ে পালিয়ে এক গাছের কোটরে ঢুকলেন। যতদিন না এ তাজা খবর বাসি হল, আর একটা নতুন গুজব ছড়াল, তিনি কোটর থেকে বেরোন নি।

জেনে রাখ

অল্প কথায়/যিনি লিখেছেন : লোককথার প্রথম কথকের নাম আজ আর জানার কোনো উপায় নেই। শুনে শুনে প্রথম যিনি লিখেছিলেন, তাঁর নামও না। আমরা লেখাটি নিয়েছি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া প্রকাশিত, এ. কে. রামানুজন সংকলিত ও সম্পাদিত 'ভারতের লোককথা' নামের বই থেকে। বইটি ইংরেজিতে। বাংলায় অনুবাদ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

শব্দের অর্থ

সারস—একরকম জলচর পাখি

দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনা

কারুক্কে—কাউকে

দিব্যি কেড়ে—শপথ করে

পড়শি—প্রতিবেশী

সোয়ামিকে—স্বামীকে

দিইছি—দিয়েছি

পেট থেকে কথা বেরোয় না—গোপনীয় কথা প্রকাশ করে না

অবিশ্বাস—বিশ্বাসের অভাব

গোপন কথা—যে-কথা অন্যকে বলবার নয়

গুজব—মুখে মুখে প্রচারিত অসম্ভব কথা

পেট ফাটছে—অন্যকে না বলতে পারার অস্বস্তি

ফাঁস করা—গোপন খবর প্রকাশ করা

গোটা—আস্ত, পুরো, অখণ্ড

পেল্লায়—বিরাট, মস্ত

ফরফর—পাতলা জিনিস বাতাসে ওড়বার শব্দ

ফরফরিয়ে—ওইরকম শব্দ করে

ঝাঁকে ঝাঁকে—দল বেঁধে আসা

যুতে—জুড়ে

অলৌকিক—যা পৃথিবীতে ঘটে না

দূরদূরান্তের—বহু দূরের

কোটর—গাছের গায়ে তৈরি গর্ত

তাজা—টাটকা

বাসি—টাটকা নয়, পুরানো

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) লোককথা কাকে বলে?

খ) এ গল্প প্রথম কে বলেছিলেন, তার নাম কি বলা যায়?

গ) গুজব কাকে বলে?

ঘ) গুজবে বিশ্বাস করা কি উচিত?

ঙ) পণ্ডিতের গ্রামে অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে মানুষজন কীভাবে আসেত লাগল?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'কাউকে বলা দরকার, তাই তোমাকে বলছি।'— বক্তা কে? 'তোমাকে' বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? কোন 'ঘটনা'টি বলা দরকার?

খ) "তাই চিন্তায় পড়েছি ভাই।"— কে বলছে? 'চিন্তা' কী নিয়ে?

গ) 'এমন সব বিপদ ঘটেও, কেটেও যায়।' বক্তা কে? কাকে বলছে? কোন বিপদের কথা বলা হচ্ছে?

ঘ) 'এক গাছের কোটরে ঢুকলেন।' কে ঢুকলেন? কেন ঢুকলেন? বেরোলেন কখন?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) 'মুখের মধ্যে সারস' কীরকম লেখা?

খ) পণ্ডিতের ঘটনা তার বউ-এর মুখে কতখানি বাড়ল?

গ) ওই ঘটনা বউয়ের বন্ধুর মুখে কী দাঁড়াল?

ঘ) গ্রামে গুজব ছড়াবার পর কী হল?

ঙ) পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত কী করলেন?

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) পণ্ডিতকে নিয়ে গুজবের ডালপালা কীভাবে ছড়ালো গুছিয়ে লেখ।

শব্দের ঝাঁপি

কারুক্কে কথা দিইছি সোয়ামিকে বলিছি পেল্লায় গোটা মুতে

তাজা বাসি বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই ফরফরিয়ে দিব্যি কাড়া

পেট থেকে কথা বেরনো গোপন কথা বিপদ ঘটা কেটে যাওয়া

গুজব ছড়ানো পেটফাটা ফাঁস করা

ব্যাকরণ:

ক) বাক্যরচনা কর: গোটা পেল্লায় দিব্যি কাড়া ফাঁস করা বাসি

খ) অর্থ লেখ: পড়শি অলৌকিক তাজা সোয়ামিকে গোটা

গ) কোনটি কী পদ লেখ: দুশ্চিন্তা তাই পণ্ডিত ঝাঁক

ওরিগামি একটি জাপানি শিল্প, যাতে কাগজকে বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে অনেক জিনিস অথবা প্রাণীর রূপ দেওয়া যায়। তুমি কি ওরিগামির সাহায্য নিয়ে একটি সারস বানাতে পারবে? তোমার বাড়ির লোক অথবা ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারো।

৮. কেমন কল

অন্নদাশঙ্কর রায়

পড়ুয়ারা যতিচিহ্ন চিনে সেইমতো কবিতা পাঠ করতে পারবে। কবিতার সারমর্ম বুঝে তার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর বলতে এবং লিখতে পারবে।

ও বড়মানুষের ঝি
ইঁদুরে খেয়েছে ঘি
তাইতো কেমন ইঁদুর-ধরা
কল এনেছি।

দেখি দেখি এ কী!
এ কল যে লাফায়!
ও মা এ যে ঝাঁপায়!
আঁচড়ায় কামড়ায়
হাঁফায়।
ও মা এ যে ডাকে
মিআঁউ মিআঁউ মিউঁ!

ও ভালোমানুষের পুত
বেড়ালে খেয়েছে দুধ।
এবার একটা বেড়াল-ধরা
কল এনে দিউ।

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/কবির কথা: অন্নদাশঙ্কর রায়। জন্ম ১৫ মার্চ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে, ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। ছোটোদের জন্য অনেক ছড়া লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম—বিনুর বই, রাঙা ধানের খই, খোকা ও খুকু, হৈ রে বাবুই হৈ প্রভৃতি। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ২০০২ খ্রি.। এই ছড়াটি তাঁর ছড়া সমগ্র বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে/যা পড়লে: বাড়িতে ইঁদুরের উৎপাত। তাই ইঁদুর ধরার জন্য একটা কল আনা হল। কিন্তু এ কেমন কল? এ যে লাফায় ঝাঁপায় কামড়ায়। আবার মিঁয়াউ মিঁয়াউ করে ডাকে। তা তো ডাকবেই। কারণ এ-কলের নাম যে বিড়াল। বাড়িতে বিড়াল এল, ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ হল। কিন্তু বিড়াল তো কেবল ইঁদুরই ধরে না— সে যে দুধও খেয়ে নেয়। এবার যে একটা বেড়াল ধরার কল আনতে হবে!

মনে রেখো

এটি অন্যরকম কবিতা। একে বলে ছড়া। এটি একটি মজার ছড়া। সব কবিতায় কবির একটি বলার কথা থাকে। শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে সেই কথাটি বুঝে নিতে হয়। ছড়াতেও বলার কথা থাকে। তবে সবসময় সব শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে সেই কথাটি বুঝে নেওয়ার দরকার হয় না। এমন কিছু শব্দ, ছবি ছড়ায় থাকে বাস্তবে যার দেখা পাওয়া যায় না। ছড়ার আসল উদ্দেশ্য মজার পরিবেশ তৈরি করা। এই ছড়াটিতে ইঁদুরের ঘি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইঁদুর কি ঘি খায়? বোধ হয় না। আবার দেখ, দ্বিতীয় স্তবক পড়তে গিয়ে প্রথমে মনে হয়, এ কী রকম ইঁদুর-ধরা কল যে লাফায়-ঝাঁপায়-কামড়ায়? কিন্তু এর পরের লাইন দুটো পড়লেই বোঝা যায়, এই কলের নাম বিড়াল। একেবারে শেষ লাইনের শেষ শব্দটি হল 'দিউ'। 'দিউ' বলে বাংলার কোনো শব্দ নেই। আসলে শব্দটি হল 'দেই'। কিন্তু 'দেই' না লিখে 'দিউ' লেখা হয়েছে 'মিউ' শব্দের সঙ্গে মিল রাখার জন্য।

এই ছড়ার ইঁদুর-ধরা কল কী কী করে: লাফায়-ঝাঁপায়-আঁচড়ায়-কামড়ায়-হাঁফায়-মিঁয়াউ মিঁয়াউ মিঁউ ডাকে- দুধ খায়

শব্দের অর্থ

ঝি-মেয়ে   পুত-পুত্র, ছেলে   দিউ-দেই

কতটা শেখা হল

১. পাঁচমিশালি প্রশ্ন:

ক) ছড়াটি মুখস্থ লেখ। এটি কার লেখা?

খ) ইঁদুর-ধরা কলটি কি সত্যিকারের 'কল' না অন্য কিছু?

গ) ইঁদুর-ধরা কল মানে যে বিড়াল, ছড়াটি পড়ার সময় গোড়ায় কি তোমার তা মনে হয়েছিল?

ঘ) এই কলটি বাড়িতে আনার ফলে কী সুবিধে এবং কী অসুবিধে হল?

ঙ) ছড়াটি পড়ে তুমি কীরকম মজা পেলে বল। মজা না পেয়ে থাকলে তা-ও বল।

চ) গদ্য করে লেখ : ইঁদুর খেয়েছে ঘি। বেড়ালে খেয়েছে দুধ।

ছ) মিল করে শব্দ লেখ : ঝি লাফায় দিউ

জ) ছড়া থেকে বেছে নিয়ে চন্দ্রবিন্দু যোগ করে পাঁচটি শব্দ লেখ।

৯. শকুনির ডিম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ুয়ারা গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

পাখির মতো আকাশে ওড়ার ইচ্ছে তো মানুষের সেই কতদিনের। কেবল, কীভাবে ওড়া যাবে সেটাই ছিল ভাবনা। আর সেই ভাবনা থেকেই এরোপ্লেন আবিষ্কার করে মানুষ একদিন আকাশে উড়ল। অপু যেভাবে উড়তে চেয়েছে সেটা ভুল হলেও তার ওড়ার ইচ্ছেটা খুবই স্বাভাবিক। ওইরকম ইচ্ছে তোমাদের হয় না?

সেদিন দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করে অপু চুপি চুপি তাঁর বইয়ের বাক্সটা লুকিয়ে খুলল। একখানা বইয়ের মলাট খুলে দেখল নাম লেখা আছে ‘সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ’। অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই মলাট— নানা জায়গায় চটা উঠে গেছে। অপু বইখানা নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিল, কেমন পুরানো-পুরানো গন্ধ! এইরকম পুরানো বইয়ের উপরই তার প্রধান মোহ। সেইজন্যই সে বইখানা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে অন্যান্য বই তুলে বাক্সে বন্ধ করে দিল।

লুকিয়ে পড়তে পড়তে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়ল বড়ো অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনলে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় বটে— কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে, সে পড়ে দেখল। পারদের গুণ বর্ণনা করতে করতে লেখক লিখেছেন,— শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরে কয়েকদিন রোদে রাখতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরে মানুষ ইচ্ছে করলে শূন্যমার্গে যেমন ইচ্ছে বিচরণ করতে পারে!

অপু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না,—আবার পড়ল—আবার পড়ল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকিয়ে রেখে বাইরে গিয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে অবাক হয়ে গেল।

দিদিকে জিজ্ঞেস করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি? তার দিদি বলতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীপু, কিনু, পটল,

নেড়া—সকলকে জিজ্ঞেস করে! কেউ বলে—সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়! তার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস। অপু ঘরে ঢুকে শোবার ভান করে ও বইখানা খুলে সেই জায়গাটা আবার পড়ে দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়বার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কারও বাড়ি নেই, শুধু তার বাবারই আছে, হয়তো এই জায়গাটা আর কেউ পড়ে দেখেনি, শুধু তারই চোখে পড়েছে এতদিনে।

পারদের জন্য ভাবনা নেই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, সেটা সে জোগাড় করতে পারবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কী করে পায়?

সন্ধান অবশেষে মিলল। হীরু নাপিতের কাঁঠাল-তলায় রাখালরা গরু বেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনতে যায়। অপু গিয়ে তাদের পাড়ার রাখালকে বলল— তোরা কত মাঠে-মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাদের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে কোমরের থলি থেকে দুটো কালো রঙের ছোটো-ছোটো ডিম বের করে বলল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি! পরে আহ্লাদের সঙ্গে নেড়েচেড়ে বলল—শকুনির ডিম!—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি-ভুরি প্রমাণ উত্থাপন করল। এটা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করে কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকে এটা সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু দুটি দু'আনার কমে দেবে না।

পারিশ্রমিক শুনে অপু অন্ধকার দেখল। বলল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি সব।

রাখাল নগদ পয়সা ছাড়া রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর এসে চার পয়সায় দাঁড়াল। অপু দিদির কাছে চেয়ে-চিন্তে আর দুটি পয়সা জোগাড় করে দাম চুকিয়ে ডিম দুটি নিল।

ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হয়ে ফুলে উঠল। তারপর যেন একটু সন্দেহের ছায়া তার মনে এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার আগে একা-একা নেড়াদের আমগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসে সে ভাবতে লাগল— সত্যি সত্যি ওড়া যাবে ত! আচ্ছা সে উড়ে কোথায় যাবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে, সেখানে?

নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারা যেখানে উঠেছে ওখানে!

সেইদিনই, কি তার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলতে পাকাবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরোর তাল হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন ঠক্ করে তার পিছন থেকে গড়িয়ে মেজের ওপর পড়ে গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না— দুর্গা মেজে থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বলল— ওমা, কীসের দুটো বড়ো বড়ো ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে— দেখেচো কী পাখি ডিম পেড়েছে ঘরের মধ্যে মা!

তার পর কী ঘটল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সমস্ত দিন খেলো না। রুদ্রমূর্তি, কান্নাকাটি— হৈ হৈ কাণ্ড। তার মা ঘাটে গল্প করে— ছেলেটার যে কী কাণ্ড! ওমা, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে? ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা— তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কীসের ডিম এনে বলেচে— এই নাও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা, সে আর কী বলবো! কী করি যে এ-ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কী করে জানবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়েনি, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহলে ত সকলেই উড়ত!

জেনে রাখ

অল্প কথায়/যিনি লিখেছেন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে। শৈশব থেকেই পল্লি-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই পথের পাঁচালী। অন্যান্য কয়েকটি রচনা: অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন, বনে পাহাড়ে, মরণের ডঙ্কা বাজে, হীরা মানিক জ্বলে, চাঁদের পাহাড়। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই লেখাটি পথের পাঁচালী উপন্যাস থেকে নেওয়া। সাধুভাষা বদলে চলিত ভাষা করা হয়েছে।

একটি কথা মনে রেখ

মানুষের মুখের কথায়, অনেক সময় 'ছ' অক্ষরটির উচ্চারণ 'চ' হয়ে যায়। এই গল্পে তোমরা দেখবে অনেক জায়গায় 'এনেচি', 'দেখেচো', 'গিয়েচে' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কথ্য ভাষায় এমন হয়। তোমরা কিন্তু লেখার সময় 'এনেছি', 'দেখেছো', 'গিয়েছে' লিখবে।

শব্দের অর্থ

শকুনি—মাংসাশী পাখি
মার্বেল কাগজ—এক-পিঠ চকচকে একরকম রঙিন কাগজ
চটা—ওপরের পাতলা অংশ উঠে যাওয়া
পারদ—একরকম ধাতু
শূন্যমার্গে—আকাশ-পথে
বিচরণ—চলাফেরা
বিপন্ন—বিপদগ্রস্ত
মগডাল—সবচেয়ে ওপরের ডাল
কড়ি—শামুকের মতো জীবের খোলা
পারিশ্রমিক—মজুরি
সলিতা—সলতে বা পলতে
মেজে—মেঝে
রুদ্রমূর্তি—খুব বেশি রেগে যাওয়ার অবস্থা
ভুরি-ভুরি—প্রচুর

নাম-পরিচয়: অপু— অপূর্বকুমার রায় বাবা— হরিহর রায় মা— সর্বজয়া দিদি— দুর্গা

বাক্যের ব্যাখ্যা

'—এই দ্যাখ ঠাকুর এনেচি'। অপুর বাবা ছিলেন পূজারি ব্রাহ্মণ। যাঁরা পুজো করেন তাঁরা পুরোহিত, আমরা তাঁদের বলি ঠাকুরমশাই। মাঝে মাঝে অপুও পুজো করে। তাই রাখাল তাকে ঠাকুর বলছে।

'ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা যেন ফুঁ দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হয়ে ফুলে উঠল'— অপু কল্পনা করতে ভালোবাসত। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা সে ভাবত। শকুনির ডিম পাওয়া যাবে কী না, সে আকাশে উড়তে পারবে কী না— এই নিয়ে তার মনে উদ্বেগ ছিল। ডিম হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে মনটা বাতাস-ভরা বেলুনের মতো হালকা হয়ে গেল।

'...বাবা যেখানে আছেন সেখানে?'— অপুর বাবা কাজের খোঁজে নানা জায়গায় যেতেন। অপুর যত ভাব ছিল বাবার সঙ্গেই। তাই বাবা যেখানে আছেন সেখানে উড়ে যাবার কথা সে ভাবছে।

'সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলতে পাকাবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজছিল।'— আগেকার দিনে গ্রামে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলত। প্রদীপ জ্বালাবার জন্য চাই রেড়ি বা সরষের তেল আর সলতে বা পলতে। সলতে তৈরি করতে হয় ন্যাকড়া পাকিয়ে। তাই দুর্গা ন্যাকড়া খুঁজছে।

'তার মার ঘাটে গল্প করে'— শহরের মতো গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে জলের কল থাকে না। সেখানে বাসন মাজা কাপড় কাচার কাজ করতে বাড়ির মেয়েরা পুকুরঘাটে যায়। তখন নানা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে গল্প হয়।

'ছেলেটা যে কী বোকা, সে আর কী বলবো!'— অপু যা করে, যা ভাবে তার মধ্যে ওর মা সর্বজয়া কোনো যুক্তি খুঁজে পান না। তিনি চান অপুও আর পাঁচটি ছেলের মতো হোক। লেখাপড়া করুক। মানুষ হোক। কিন্তু তা না করে অপু মাঠেঘাটে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। অদ্ভুত সব কাজ করে। যেমন, আকাশে ওড়ার জন্য চার পয়সা খরচ করে কাকের না কীসের ডিম কেনা। তাঁর কাছে এটা নিছক বোকামি। এই ছেলেকে নিয়ে তাঁর খুব চিন্তা।

১. মুখে মুখে বল:

ক) এই লেখাটি কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ) সেই বইয়ের লেখকের নাম কী?

গ) পারদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কী লিখেছেন?

ঘ) ডিমের জন্য রাখাল প্রথমে কত দাম চেয়েছিল?

ঙ) রাখাল ডিম দুটো কোথা থেকে জোগাড় করেছে বলে বলেছে?

চ) দুর্গা ছেঁড়া ন্যাকড়া খুঁজছিল কেন?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে',— কোন বইখানার? বইতে কী লেখা আছে?

খ) 'সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে, উঁচু গাছের মাথায়!'— একথা কারা বলেছে? কাকে বলেছে? উঁচু গাছের মাথায় কী আছে?

গ) 'একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, সেটা সে জোগাড় করতে পারবে এখন।'— ভাঙা আয়নাতে কী আছে? সে জিনিস অপুর কোন কাজে লাগবে?

ঘ) 'রাখাল নগদ পয়সা ছাড়া রাজি হয় না'।— রাখাল কে? নগদ পয়সা ছাড়া সে কী দিতে রাজি হয় না?

ঙ) 'এঃ পড়ে একেবারে, গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে।'— কে বলেছে? কী গুঁড়ো হয়ে গেছে? ওই জিনিস তাকের ওপর রেখেছিল কে?

চ) 'ওমা, এমন কথা তো কখনো শুনিনি!'— বক্তা কে? তিনি কী কথা শোনেননি?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) বাবার বাক্স থেকে অপু যে বইটি বের করল সেটি কীরকম?

খ) অপু কাকে কাকে শকুনির ডিমের কথা জিজ্ঞেস করল?

গ) শকুনির ডিম কার কাছ থেকে কত পয়সা দিয়ে অপু কিনল?

ঘ) সহজে আকাশে ওড়বার উপায় আর কেউ জানতে পারেনি কেন?

ঙ) ডিম হাতে পাবার পর অপু কোথায় কোথায় উড়ে যাবার কথা ভাবল?

চ) ডিম ভেঙে যাবার পর অপু কী করল?

ছ) অপুর মা ঘাটে অন্যদের কাছে ছেলের সম্বন্ধে কী বললেন?

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) অপু কি বোকা? না, সরল? না, ভাবুক? তোমার কী মনে হয়? গুছিয়ে লেখ।

খ) গল্পে যেভাবে পড়েছ সেইভাবে ঘটনা পর পর সাজিয়ে লেখ

বই পড়ে অপু আকাশে ওড়ার উপায় জানতে পারল।

তারপর সেটা মুখে পুরলেই মানুষ উড়তে পারে।

এখন কেবল চাই শকুনির ডিম।

দিদি বা বন্ধুরা কেউ শকুনির ডিমের খোঁজ দিতে পারল না।

শকুনির ডিমে পারদ পুরে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।

বাড়িতে একখানা ভাঙা আয়নার পেছনে পারা আছে।

অপুর আকাশে ওড়া হল না।

সলতে পাকাবার ন্যাকড়া নিতে গিয়ে তার দিদি ডিম ভেঙে ফেলল।

ডিম দুটো অপু তাকের ওপর রেখেছিল।

রাখালের কাছ থেকে চার পয়সায় অপু দুটো ডিম কিনল।

শব্দের ঝাঁপি

চুপি চুপি পুরানো পুরানো করতে করতে ভাবতে ভাবতে মাঠে মাঠে ছোটো ছোটো
ভুরি-ভুরি সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যি হাতড়ে হাতড়ে বড়ো বড়ো
কাঁঠাল তলা তেল-তামাক চেয়ে-চিন্তে ছেঁড়া-খোঁড়া মোহ শূন্যমার্গ

ব্যাকরণ:

ক) অর্থ লেখ: শূন্যমার্গ বিপন্ন পারদ পারিশ্রমিক

খ) বাক্যরচনা কর: নেড়ে-চেড়ে ভুরি-ভুরি ছেঁড়া-খোঁড়া চেয়ে-চিন্তে ছোটো-ছোটো মাঠে-মাঠে

গ) বিপরীত শব্দ লেখ: অনুপস্থিত বন্ধ বিশ্বাস উপায় হালকা

ঘ) পদ-পরিবর্তন কর: গুণ চক্ষু পারিশ্রমিক বোকা মাঠ

শকুনের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করো। তাদের কোথায় পাওয়া যায়, তারা কী খায়, তারা মানুষের উপকারে আসে কীনা, তাদের কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে কীনা ইত্যাদি। এই সব খুঁটিনাটি তথ্য তোমার খাতায় লিখে তোমার বন্ধুদের পড়ে শোনাও।

অপু বইটি পড়ে, তাতে যা লেখা আছে, সব কিছু বিশ্বাস করল। তুমি যদি অপুর জায়গায় হতে, তা হলে কী করতে?

ক) অপুর মতন পারা আর শকুনের ডিম জোগাড় করে উড়বার চেষ্টা করতে।

খ) তোমার মা অথবা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বইটিতে যা লেখা আছে তা সত্যি কী না।

গ) তোমার বন্ধুদের এই বইটি পড়তে দিতে এবং সবাই মিলে উড়তে চেষ্টা করতে।

১০. অনুকূলবাবু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়ুয়ারা যতিচিহ্ন চিনে সেইমতো কবিতা পাঠ করতে পারবে। কবিতার সারমর্ম বুঝে তার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর বলতে এবং লিখতে পারবে।

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূলবাবু বলে, 'ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই—
বৃথাই, খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।'

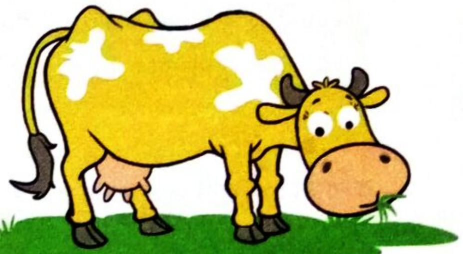

গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে—
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য!

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।

জেনে রাখ

সংক্ষেপে কবির কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ৭ মে ১৮৬১ খ্রি., ২৫ শে বৈশাখ ১২৬৮ ব. কলকাতায়। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা, সারদা দেবী। ছোটোবেলায় স্কুলে ভর্তি হলেও ক্লাসের ধরাবাঁধা লেখাপড়ায় মন বসাতে পারেননি। পড়াশুনা করেছেন গৃহশিক্ষকের কাছে। সারা জীবন অজস্র কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্যে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৪১ খ্রি. ৭ অগাস্ট, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শে শ্রাবণ তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি খাপছাড়া নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: ঘাসে ভিটামিন আছে। সেই ঘাস খেয়ে গোরু, ঘোড়া, ভেড়ারা যে দিব্যি বেঁচে আছে সে ত চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়। তাই অনুকূলবাবু চান, মানুষকেও ঘাস খাবার অভ্যেস করতে হবে। ধান, গম, ডাল তরিতরকারি চাষ করে মিছিমিছি পয়সা খরচ করবার কোনো দরকার নেই। আগে নিজে ঘাস খেয়ে তার পর অন্যকে শেখাবেন বলে তিনি মাঠে চরতে চলে যান। তাঁর স্ত্রী কাকুতিমিনতি করেন, পায়ে ধরে বারণ করেন। কিন্তু অনুকূলবাবু পণ করেছেন, চাষবাসের খরচ বাঁচিয়ে তিনি মানুষের মঙ্গল না করে ছাড়বেন না। তাই স্ত্রীর কথা তিনি কানে নেন না। কিন্তু দু'দিন যেতে-না-যেতেই ঘাস খেয়ে অসুখ করে অনুকূলবাবু মারা গেলেন। মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান কত কিছু অবিষ্কার করেছে। অনুকূলবাবুও তাই চেয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে প্রমাণ হত তাঁর ধারণা সত্যি ছিল। কিন্তু মারা যাওয়ায় তা আর প্রমাণ করা গেল না। তাই বিজ্ঞানের একটা দুঃখ থেকে গেল। কবিতাটির মধ্যে কবির রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বুঝতেই পারছ, অনুকূলবাবু বেঁচে থাকলেও প্রমাণ হত না যে মানুষ ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। মনে রেখো, এই কবিতাটি যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম 'খাপছাড়া' অর্থাৎ অনুকূলবাবুর ব্যাপারটাও নিতান্ত খাপছাড়া, উদ্ভট। সত্যি সত্যি এরকম ঘটে না, ঘটতে পারে না।

কবিতার একটি মিল লক্ষ কর :

পঙ্‌ক্তি ১ : অশ্ব
২ : পশ্য
৫ : শস্য
৮ : কস্য
১১ : অবশ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের মিল ঠিক আছে। অনেক কবিতাতেই এটা দেখতে পাবে। কিন্তু সেই মিলটাই এর পর ৫, ৮ আর ১১ লাইনে যেভাবে ফিরে ফিরে এসেছে— সেরকম মিল কবিতায় বিশেষ দেখতে পাবে না। তাছাড়া, গুণে দেখ কবিতার মোট চরণ আছে ১১টা। বিজোড় সংখ্যায় কবিতা শেষ? হতেই পারে। কবিতার বইটির নামই যে 'খাপছাড়া।'

খাপছাড়া

কবিতাটা মজার। ভাবছ, ঘাস খেয়ে বেচারা অনুকূলবাবু মারা গেলেন, এর মধ্যে মজার কী আছে? এতো রীতিমতো দুঃখের ঘটনা। আসলে তা নয়। মানুষের মনে কত সময় কত উদ্ভট, খাপছাড়া ভাব জাগে। তাই বলে কি সেই ভাবনা

অনুযায়ী কাজ করতে ছোটে? খাদ্য হিসেবে ঘাস খাবার কথা ভাবলেই কি মাঠে গিয়ে সত্যি সত্যি গোরু-ভেড়ার মতো ঘাস খেতে হবে? যদি কেউ তা করতে যায় তাহলে তার দশা অনুকূল বাবুর মতো হবে। ব্যাপারটা এই। সহজ সরল ভাষায়, মজা করে এই কথাটাই কবি বলেছেন।

শব্দের অর্থ

আঁখি মেলে পশ্য—চোখ মেলে চেয়ে দেখ

জঠরেতে—পেটে

বৃথা—অকারণ

শস্য—কৃষিকাজের দ্বারা উৎপন্ন ফসল: ধান, গম ডাল ইত্যাদি

গৃহিণী—পত্নী

দোহাই—কাকুতিমিনতি

যবে—যখন

চরে—বিচরণ করে

মানবহিতের—মানুষের মঙ্গলের

কস্য—কার

বিঁধে—বিদ্ধ করে

বাক্যের ব্যাখ্যা

'কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই',— মানুষ ঘাস খায় না। খাদ্য হিসেবে ঘাস তার কাছে নতুন। তাই কিছুদিন খেয়ে অভ্যেস করতে হবে।

'মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য।'— অনুকূলবাবু ঠিক করেছেন নিজের সংকল্প থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না। মানুষের কল্যাণ করে তবে ছাড়বেন। এরকম ধনুকভাঙা পণ যাঁরা করেন তাঁরা কি অন্যের বারণ শুনতে পারেন?

'বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।'— অনুকূলবাবু বেঁচে থাকলে প্রমাণ হত মানুষ ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। অর্থাৎ তাঁর ধারণা সত্যি ছিল। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় তা প্রমাণ করার সুযোগ আর রইল না। এটাই বিজ্ঞানের শোকের কারণ।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) গোরু ভেড়া অশ্ব কী খেয়ে বেঁচে আছে?

খ) অনুকূলবাবু কীসের খরচ বাঁচাতে চেয়েছিলেন?

গ) বিজ্ঞানের শোকটা কী?

ঘ) কেন একে মজার কবিতা বলবে?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) মানুষের কল্যাণ করতে গিয়ে অনুকূলবাবু কীভাবে প্রাণ দিলেন, সরল ভাষায় লেখ।

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) 'আঁখি মেলে পশ্য।'— কী দেখার কথা বলা হয়েছে? দেখার পর কী শেখা যাবে? তাতে কী সুবিধে হবে?

খ) 'মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য?'— মানবহিত কী? কার ঝোঁক হল? কীসের ঝোঁক হল?

গ) 'বাঁচলে প্রমাণ-শেষ, হ'ত যে অবশ্য।'— কে বাঁচলে? কী প্রমাণ হত? সত্যিই কি প্রমাণ হত?

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) যতিচিহ্ন ঠিকমতো বসিয়ে কবিতার প্রথম ৮ লাইন মুখস্থ লেখ।

শব্দের ঝাঁপি

আঁখি মেলে পশ্য   কথা শোনে কস্য   দোহাই পাড়ে   জঠরেতে

ব্যাকরণ:

ক) বিপরীত শব্দ লেখ: আছে বেঁচে অভ্যেস শেষ

খ) বাক্যরচনা কর: ভিটামিন দোহাই বিজ্ঞান অবশ্য ঝোঁক

গ) অর্থ লেখ: আঁখি পশ্য জঠর মানবহিত কস্য

নীচে যে শব্দগুলো দেওয়া হল, তাদের সাথে ছন্দ মিলিয়ে নতুন শব্দ লেখো।

ক) ঘাস ____________

খ) লোক ____________

গ) ঠেলা ____________

ঘ) প্রণাম ____________

ঙ) খাওয়া ____________

নীচে দেওয়া প্রাণীগুলোর মধ্যে কেউ কেউ শুধু ঘাস পাতা খায়, কেউ কেউ শুধু মাংস খায়, আর কেউ কেউ আবার দুটোই খায়। এদের খাওয়ার রকম দেখে এদের নামগুলো তোমার খাতায় সাজিয়ে লেখো:

ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, ছাগল, উট, নেকড়ে, কুকুর, হাতি, সিংহ, মানুষ, কাক, ইঁদুর, পান্ডা।

১১. মানব-সেবা : ১

সুকুমার রায়

পড়ুয়ারা পাঠটি শুনে এবং পড়ে নিজের ভাষায় সেটা লিখতে পারবে এবং পড়ে শোনাতে পারবে, সেই বিষয়ে 'কেন' এবং 'কী করে' প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। কোনো কাহিনি অথবা ঘটনা শুনে তারা সেটি আবার নিজের ভাষায় গুছিয়ে বলতে ও লিখতে পারবে।

লাল ক্রস চিহ্ন লাগানো সাদা পতাকা টাঙিয়ে রেখে একদল মানুষ যুদ্ধ বন্যা ভূমিকম্পে আহত, দুর্গত মানুষদের সেবা করছেন। লাল আলো জ্বালিয়ে বিশেষ ধরনের হর্ন বাজাতে বাজাতে রোগী নিয়ে ছুটে চলেছে সাদা রঙের গাড়ি। দেখেছ নিশ্চয়ই, ছবিতে অথবা নিজের চোখে। প্রথমটির নাম 'রেডক্রস' আর দ্বিতীয়টির নাম 'অ্যাম্বুলেন্স'। আহত মানুষের সেবার জন্য এখন এই যে এত চেষ্টা, এত আয়োজন, বলতে গেলে, তার শুরুটা যিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল বড়োলোকের মেয়ে। তাঁর পয়সাকড়ির ভাবনা ছিল না। তাঁর বাবারও খুব ইচ্ছে, ছেলেমেয়েরা সকলে খুব ভালো লেখাপড়া শেখে। সুতরাং অল্প বয়স থেকেই ফ্লরেন্সের মনে লেখাপড়ার ঝোঁক ছিল সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু লোকে যে ঐ বয়েস থেকেই তাঁকে ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত সেটা তাঁর লেখাপড়ার বাহাদুরির জন্য নয়— তার কারণ এই যে, তিনি যেমন মনপ্রাণ দিয়ে সকলকে ভালোবাসতেন, লোকের সেবা করতেন এবং লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হতে পারতেন, এমন আর কেউ পারত না। আশেপাশে যেখানে যত গরিবের স্কুল আর হাসপাতাল ছিল, ফ্লরেন্স তার সবগুলির মধ্যেই থাকতেন।

সেই সময়ে ইংলন্ডে কয়েদিদের অবস্থা বড়ো ভয়ানক ছিল। জেলখানাগুলি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এবং তাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী যে, একবার যে জেলে ঢুকেছে তার পক্ষে ভবিষ্যতে আবার ভালো হওয়া একরকম অসম্ভব। মিসেস ফ্রাই নামে একজন ইংরেজ মহিলা এই কয়েদিদের উন্নতির জন্য নানারকম চেষ্টা করছিলেন— কীসে তারা আবার চাকরি পায়, কীসে তারা সমাজের কাছে ভালো ব্যবহার পায়, কীসে তাদের মধ্যে আবার সাধুভাব ফিরে আসে, তিনি এই চিন্তাতেই সমস্ত সময় কাটাতেন। এঁর সঙ্গে ফ্লরেন্সের আলাপ হওয়ায়, দু'জনেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গেল।

ফ্লরেন্স বুঝলেন যে ইংলন্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করতে হলে রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই।

সে সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ বিষয়ে কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে এমন সব দল ছিল, যাঁরা আবশ্যক মতো রোগীর দেখাশুনো ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকতেন। ফ্রান্স দেশে 'সিস্টার্স অব মার্সি' নামে একদল সন্ন্যাসিনী বহুকাল থেকে অতি আশ্চর্যভাবে এই কাজ করে আসছিলেন। জার্মানিতেও মানব-সেবা শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত ছিল। মিসেস ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স পরামর্শ করলেন, 'একবার ওইসব দেশ ঘুরে এ বিষয়ে কিছু শিক্ষা করে আসি।'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। ফ্লরেন্স পরম উৎসাহে বিদেশে গিয়ে এই শিক্ষায় লেগে রইলেন। সেখানে তাঁর বুদ্ধি, উৎসাহ ও সেবার আগ্রহ দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল। তিনি ছ'মাসের মধ্যে রীতিমতো পরীক্ষা পাশ করে এবং সকল বিষয়ে আশ্চর্য সফলতা দেখিয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর এমন ভেঙে পড়ল যে, তাঁর কাজ আরম্ভ করতে আরও বছরখানেক দেরি হয়ে গেল। সুস্থ হয়েই তিনি চারদিকে হাসপাতাল আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এনে ফেললেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ বছর।

পড়ুয়াদের বলুন যে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প বলা হত, কেননা ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় তিনি একটি লন্ঠন হাতে পুরো হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে আহত সৈনিকদের সেবা করতেন।

জেনে রাখ

অল্প কথায় / যিনি লিখেছেন: সুকুমার রায়। জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায়। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। মা, বিধুমুখী দেবী। খুব ছোটোবেলা থেকেই সুকুমার ছবি আঁকতেন আর মুখে মুখে ছড়া বানাতেন। কলকাতার স্কুলে ও কলেজে লেখাপড়া শিখে তিনি বিলেত যান ছাপার কাজ শিখতে। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে সন্দেশ পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবি ও লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ছোটোদের জন্য চমৎকার এই পত্রিকাটি বের করতেন তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর। ছোটোদের জন্য মজার ছড়া, গল্প, নাটক ছাড়াও তিনি নানা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম : আবোল তাবোল, খাই খাই, অবাক জলপান, ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হযবরল। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এই লেখাটি সুকুমার রচনা সমগ্র (২য় খণ্ড) থেকে নেওয়া। মূল রচনাটি সাধুভাষায় লেখা। এখানে চলিত ভাষায় বদলে নেওয়া হয়েছে।

শব্দের অর্থ

বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা
আবশ্যকতা—দরকারমতো
সাধুভাব—খারাপ চিন্তার বদলে ভালো চিন্তা করা
আতুরাশ্রম—দুঃখী মানুষদের থাকার জায়গা
প্রতিষ্ঠা—স্থাপন
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী—কাউকে সুখী দেখলে নিজেও সুখী হওয়া, কারও দুঃখ দেখলে তার দুঃখের ভাগ নিয়ে সমব্যথী হওয়া

নাম পরিচয়: ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল: জন্ম — ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ, ইংলন্ডে। মৃত্যু — ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর জন্ম কোন দেশে?
খ) ফ্লরেন্সদের পরিবারের অবস্থা কেমন ছিল?
গ) ফ্লরেন্সের বাবার কী ইচ্ছা ছিল?
ঘ) সেবার কাজ করতে গিয়ে ফ্লরেন্স কি লেখাপড়া অবহেলা করতেন?
ঙ) ইংলন্ডে সে সময় কয়েদিদের অবস্থা কীরকম ছিল?
চ) ফ্রান্সে 'সিস্টার্স অব মার্সি' কারা ছিলেন?
ছ) কতদিনে ফ্লরেন্স পরীক্ষা পাশ করেন?
জ) দেশে ফিরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল কেন?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হতে পারতেন।'— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? 'সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী' হওয়ার মানে কী?
খ) 'তাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী'— কীসের বন্দোবস্ত? তাকে বিশ্রী বলা হয়েছে কেন?
গ) 'একবার ওইসব দেশ ঘুরে এ-বিষয়ে কিছু শিক্ষা করে আসি।'— একথা কে ভেবেছিলেন? কোন বিষয়ে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) ফ্লরেন্সকে লোকে কেন ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত?
খ) জেল থেকে বেরিয়ে কয়েদিরা ভালোভাবে বাঁচতে পারত না কেন?
গ) মিসেস ফ্রাই সবসময় কী চিন্তা করতেন?
ঘ) মিসেস ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স কী বিষয়ে পরামর্শ করলেন?
ঙ) বিদেশে ফ্লরেন্সের কী দেখে সবাই অবাক হয়েছিল?
চ) দেশে ফিরে ফ্লরেন্স কী করলেন?

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) এই লেখায় ফ্লরেন্সের কী কী ভালো কাজের কথা বলা হয়েছে? অল্প কথায় লেখ।

সাধুভাষা / চলিত ভাষা

সুকুমার রায় লিখেছেন: ফ্লরেন্স বুঝিলেন যে ইংলন্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করিতে হইলে রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই।

এখানে লেখা হয়েছে: ফ্লরেন্স বুঝলেন যে ইংলন্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করতে হলে রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই।

ব্যাকরণ:

ক) পদ–পরিবর্তন কর: মেয়ে বাহাদুরি উন্নতি শরীর বৎসর

খ) লিঙ্গ পরিবর্তন কর: মেয়ে বাবা মহিলা রোগী সন্ন্যাসিনী

গ) এক বচন থেকে বহুবচন এবং বহুবচন থেকে এক বচনে পরিণত কর: কয়েদিদের সন্ন্যাসিনী ইংরেজ মহিলা

ঘ) বাক্যরচনা কর: লেখাপড়া পয়সাকড়ি বাহাদুরি হাসপাতাল

ফার্স্ট এইড বক্স কাকে বলে জানো কি? তাতে কী কী থাকে? তোমার বিদ্যালয়ে ফার্স্ট এইড বক্স আছে?

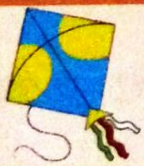

তুমি কি কখনো আহত পশুপাখি, অসহায় দুঃখী মানুষের সেবা করেছ? করে থাকলে সে কথা লেখ।

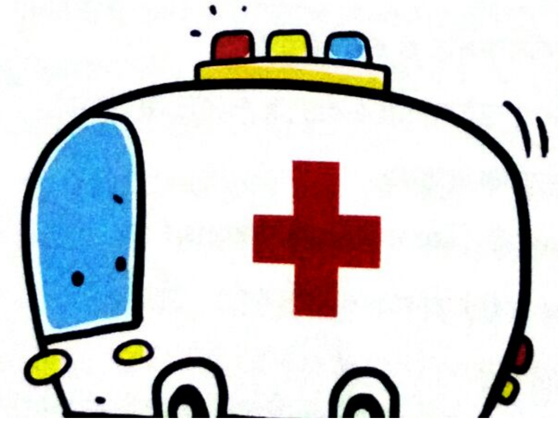

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনি ও বর্ণ এবং বর্ণ বিশ্লেষণ

কথা বলার সময় আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত ছোটো ছোটো আওয়াজগুলিকে বলা হয় ধ্বনি। আর ধ্বনির পরে ধ্বনি জুড়ে তৈরি হয় শব্দ। তাই যে কোনো শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যাবে কতকগুলো ধ্বনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'আমরা' শব্দটি ভাঙলে পাই ৫টি ধ্বনি—আ + ম্ + আ+ র্+ আ। 'সবুজ' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যাবে স্ + অ+ ব্ + উ + জ্ + অ ৬টি ধ্বনি।

ধ্বনির শ্রেণি

ধ্বনিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (ক) স্বরধ্বনি ও (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি।

(ক) **স্বরধ্বনি :** যে সব ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়, তাদের স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির সংখ্যা ১১ টি।

যেমন— অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ঌ

এ ঐ ও ঔ

বাংলা ভাষায় ঌ ধ্বনিটির ব্যবহার নেই। তাই এটিকে স্বরধ্বনির মধ্যে ধরা হয় না।

স্বরধ্বনি গুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—

হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।

যে সব স্বরধ্বনির উচ্চারণ খুব কম সময়লাগে তাদের **হ্রস্বস্বর** বলে। হ্রস্বস্বর চারটি—অ, ই, উ, ঋ।

আর যে সমস্ত স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে দীর্ঘসময় লাগে তাদের বলা হয় **দীর্ঘস্বর**। দীর্ঘস্বরের সাতটি—আ, ঈ, ঊ, এ ঐ, ও, ঔ।

দীর্ঘস্বর গুলি মধ্যে আবার ঐ এবং ঔ-এর উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ঐ ধ্বনিদ্বয়ের মধ্যে আছে ও+ ই এবং ঔ ধ্বনির মধ্যে আছে ও + উ । যেহেতু দুটি করে স্বরধ্বনির মিলনে তৈরি ঐ এবং ঔ, তাই এদের যুক্তস্বর, যৌগিক স্বর অথবা সন্ধ্যক্ষর বলা হয়।

বর্ণ ও তার শ্রেণি বিভাগ

ধ্বনির লিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে বলা হয় বর্ণ। পৃথিবীর ভাষারই নিজস্ব বর্ণ আছে। সবভাষাতেই বর্ণের সংখ্যা অনেক। কোনো একটি ভাষার সব কটি বর্ণ নিয়ে হয় বর্ণমালা।

সব ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একটি বর্ণমালা আছে। এতে বাংলা বর্ণমালার বর্ণের সমষ্টি ৪৬ টি। এই বর্ণগুলিক্কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণগুলি অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে। স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১ টি (ঌ বর্ণের ব্যবহার না থাকায় এটিকে বর্ণশাখা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে)। স্বরবর্ণগুলি হলো

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	ঌ
এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপকে বলাহয় ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৪০টি।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাৰা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পত্রারে না। যেমন 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চত্রারণ ক-এর পম্‌রে বিসর্গ বসালে যেমন উচ্চারণ হয়, ঠিক তেমনি। একে আরও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে গেলে এর সঙ্গো স্বরধ্বনির 'অ' যোগ করতে হয়। যেমন ক্ + অ = ক। খ্ + অ = খ। গ্ + অ = গ। ঘ্ + অ = ঘ। প্ + অ = প ইত্যাদি।

তাই কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যতি হসন্ত (্) চিহ্ন থাকে তবে বুঝতে হবে এর সঙ্গো অ-কার যুক্ত নেই। আবার কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে হসন্ত (্) চিহ্ন টি না থাকলে বুঝতে হবে এর সঙ্গো অ-কার যুক্ত আছে।

ব্যাকরণবিদরা অবশ্য ড়, ঢ়, য় ৎ, ঃ, ঁ কে এগুলিকে আলাদা ব্যঞ্জনবর্ণ বলেন না। কারণ ড় বর্ণ টি প্রকৃত পক্ষে ড এর ঢ় বর্ণটি প্রকৃত পক্ষে ঢ এবং য় ব্যাকরণবিদরা বর্ণটি 'য' এর এবং ৎ টি ত এর অন্যরূপ। আর চন্দ্রবিন্দুর কোনো আলাদা উচ্চারণ নেই।

বাগযন্ত্র

বাগযন্ত্র কাকে বলে? উচ্চারণের জন্য আমাদের মুখগহ্বরের ভিতর কতকগুলি জায়গা আছে। এদের সাহায্য দিয়েই আমরা উচ্চারণ করি বা কথা বলি। এই উচ্চারণ স্থানগুলিকে বলা হয় **বাগযন্ত্র**।

কথা বলার সময় মুখের ভিতরের এই বাগযন্ত্রটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। জিহ্বা এব্যাপারে খুবই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য শুধু মাত্র জিহ্বা দিয়ে কথা বলা যায় না। জিহ্বা দিয়ে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধ্বা, দন্ত্য, ওষ্ঠ, এবং নাসিকা—এদের যে কোনো একটিকে স্পর্শ করতে হয়। তাই জিহ্বা,কণ্ঠ, তালু, মুর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ ও নাসিকাকে একত্রে বাগযন্ত্র বলা হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিবিভাগ

উচ্চারণেব তারতম্য অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত এই ২৫টি বর্ণকে উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার সঙ্গো কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত বা ওষ্ঠের স্পর্শ করতে হয়। তাই এদের বলে স্পর্শবর্ণ।

২৫টি স্পর্শবর্ণকে আবার পাঁচটি বর্গে ভাগ করা যায়। যেমন

		প্রথম বর্ণ	বর্গের নাম	উচ্চারণ স্থান
(ক) কণ্ঠ বর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ	ক	ক-বর্গ	কণ্ঠ্য
(খ) তালব্য বর্ণ	চ ছ জ ঝ ঞ	চ	চ-বর্গ	তালু
(গ) মূর্ধণ্য বর্ণ	ট ঠ ড ঢ ণ	ট	ট-বর্গ	মূর্ধা
(ঘ) দন্ত্য বর্ণ	ত থ দ ধ ন	ত	ত-বর্গ	দন্ত
(ঙ) ওষ্ঠ্য বর্ণ	প ফ ব ভ ম	প	প-বর্গ	ওষ্ঠ।

এছাড়াও (চ) অন্তঃস্থবর্ণ–য, র, ল, ব

(ছ) উষ্ম বর্ণ–শ ষ স হ

(জ) অযোগবাহবর্ণ–ং, ঃ

(ঝ) অনুনাসিক বর্ণ–ঙ, ঞ, ণ, ন, ম

অন্তঃস্থ বর্ণ : য র ল ব—এই চারটি বর্ণের অবস্থান স্পর্শ বর্ণ ও উষ্মবর্ণের মাঝে। তাই এদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

উষ্মবর্ণ : শ ষ স হ— এই চারটি বর্ণের উচ্চারণ যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ বাড়ানো যায়। তাই এদের উষ্মবর্ণ বলে।

অযোগবাহ বর্ণ : অযোগবাহবর্ণ গুলি হলো ং এবং ঃ। মূলবর্ণ মালার সঙ্গো এদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই।এরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বাইরে অবস্থান করে। তাই এদের অযোগবাহ (ন যোগবাহ)বর্ণ বলে।

অনুনাসিক বর্ণ : ঙ ঞ ণ ন ম—এই পাঁচটি ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের নাসিকার সাহায্য নিতে হয়। তাই এদের অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয়। এদের উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।

সানুনাসিক বর্ণ : ঁ চন্দ্রবিন্দুকে বাংলা বর্ণমালার মধ্যে ধরা হয় নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর উচ্চারণ হয় নাক দিয়ে। তাই একে সানুনাসিক বর্ণ বলে। যেমন—কাঁধ, বাঁধ, হাঁস।

কার ও স্বরবর্ণের চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গো স্বরবর্ণের মিলনকে বানান বলে। কিন্তু বানান করার সময় স্বরবর্ণের রূপ পরিবর্তিত হয়ে কতকগুলি প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়। এই প্রতীকগুলিকে স্বরবর্ণের চিহ্ন বা কার বলা হয়। যেমন অ-কার, আ-কার, ই-কার, উ-কার, এ-কার, ও-কার প্রভৃতি।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে ১১ টি। এদের মধ্যে একমাত্র অ-কার বাদ দিলে প্রতিটি কার-এর আলাদা চিহ্ন আছে। কেবল অ-কারের কোনো প্রতিক চিহ্ন নেই। বানান লেখার সময় এই চিহ্নগুলি দিয়েই বানানকে সূচিত করা হয়। নিচে কারগুরি এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তাদের লিখিত রূপ দেখানো হলো।

কার	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে লিখিত রূপ	
অ-কার	চিহ্ন নেই	ক্ + অ-কার = ক	প্ + অ-কার = প
আ-কার	া	ক্ + আ-কার = কা	প্+ আ-কার = পা
ই-কার	ি	ক্ + ই-কার = কি	প্ + ই-কার = পি
ঈ-কার	ী	ক্+ ঈ-কার = কী	প+ ঈ-কার = পী
উ-কার	ু	ক্ + উ-কার = কু	প্ + উ-কার = পু
ঊ-কার	ূ	ক্ + ঊ-কার = কূ	প্+ঊ-কার = পূ
ঋ-কার	ৃ	ক্ + ঋ-কার = কৃ	প্+ ঋ-কার = পৃ
এ-কার	ে	ক্ + এ-কার = কে	প্+ এ-কার = পে
ঐ-কার	ৈ	ক্+ ঐ-কার = কৈ	প্+ ঐ-কার = পৈ
ও-কার	ো	ক্ + ও-কার = কো	প্+ ও-কার = পো
ঔ-কার	ৌ	ক্ + ঔ-কার = কৌ	প্+ ঔ-কার = পৌ

যুক্তাক্ষর

দু-তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তাক্ষর তৈরি করে। যুক্তাক্ষরের বর্ণগুলিকে আলাদাভাবে না লিখে একত্রে লেখা হয় এবং তাদের চেহারা ভিন্ন রকমের হয়।

যেমন—ক ও ষ কে জুড়ে লেখা হয় ক্ষ (রক্ষি)

ক, ষ ও ণ কে জুড়ে লেখা হয় ক্ষ্ণ (তীক্ষ্ণ)

ক, ষ ও মকে জুড়ে লেখা হয় ক্ষ্ম (লক্ষ্মী)

বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর গুলি দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের হতে পারে। নিচে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের কতকগুলি যুক্তাক্ষরের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন

ক্ + স্ = ক্স (বাক্স / ট্যাক্সি) স্ + ক্ = স্ক (তস্কর / ভাস্কর)

ম্ + প = ম্প (কম্প / ঝম্প) জ্ + ঞ্ = জ্ঞ (যজ্ঞ / আজ্ঞা)

ত্ + ত্ = ত্ত (মত্ত / সত্তা) ম্ + ফ্ = ম্ফ (লম্ফ / গুম্ফ)

ক্ + ত্ = ক্ত (ভক্ত / শক্ত)

আবার একটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য, র, ল, ব কিংবা ম যুক্ত হয়, তখন তাকে ফলা বলে। প্রতিটি ফলার

একটি আলাদা চিহ্ন আছে। যেমন

ক্ + য্ (য-ফলা) ক্য (ঐক্য/ বাক্য) চ্ + য্ (য ফলা) চ্য (বাচ্য / পাচ্য)

ক্ + ল্ (ল-ফলা) ক্ল (শুক্লা/ ঘ্ + র্ (র-ফলা) ঘ্র (ব্যাঘ্র+ সর্দঘ্র)

গ্ + ম্ (ম-ফলা) গ্ম (যুগ্ম/বাগ্মী) ম্ + ল ( ) ম্ল (ম্লান + ...)

ক্ + ব্ (ব-ফলা) ক্ব/ (পাশ্ব) জ্ + ব্ (বফলা) জ্ব (জ্বর / জ্বালা)

য্ + ক্ (ক-ফলা) ষ্ক/ (কনিষ্ক) ম + ম (ম-ফলা) ম্ম (সম্মান/ সম্মতি)

আবার 'র' কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের পরে বসলে র-এর ফলা হয় । যেমন গ্রাম। কিন্তু 'র' যদি কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের অংশে বসে, তাহলে তা রেফ হয় র-রেফ ( ) চিহ্ন হয়ে পরের ব্যঞ্জন বর্ণের মাথায় বসে। যেমন র্ + য্ = র্য (সূর্য) র্ + ন = র্ণ (পূর্ণ)।

নিচে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের দিয়ে তৈরি যুক্তাক্ষরের উদাহরণ দেওয়া হল।

যেমন ক্ + য্ + ম্ = ক্ষ্ম (লক্ষ্মণ / লক্ষ্মী) ঙ্ + ক্ + র্ = ঙ্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা)

ন্ + ত্ + র্ = ন্ত্র (যন্ত্র/মন্ত্র) স্ + ত্ + র্ = স্ত্র (অস্ত্র/শস্ত্র)

ন্ + দ্ + র্ = ন্দ্র (ইন্দ্র/দেবেন্দ্র) ত্ + ত্+ ব্ = ত্ত্ব (মহত্ত্ব /

জ্ + জ্ + র্ = জ্জ্ব (উজ্জ্বল/প্রজ্জ্বল)

কিছু সহজ প্রশ্ন ও তার উত্তর

১। **ধ্বনি কাকে বলে?**

উঃ আমরা মুখ দিয়ে নানা আওয়াজ করে থাকি—এদের ধ্বনি বলে।

২। **শব্দ কাকে বলে?**

উঃ অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টি হলো শব্দ। যেমন বাতাস (ব্ + আ + ত্ + আ + স্ + অ)

৩। **পদ কাকে বলে?**

উঃ বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন মেঘ + এ মেঘে।

৪। **সব শব্দই কি পদ?**

উঃ না। সব শব্দ পদ নয়। বিভক্তি যুক্ত না হলে শব্দ পদ হয় না।

৫। **পদ ছাড়া কি বাক্য গঠিত হয়?**

উঃ না। পদ ছাড়া বাক্য গঠিত হতে পারে না। প্রথমে শব্দকে বিভক্তি যোগ করে পদে পরিণত করতে হয়।

৬। **মাছেরা আকাশে উড়ছে—বাক্য নয় কেন?**

উঃ না, না এটি বাক্য নয়। কারণ মাছেরা আকাশে উড়তে পারে না। এটি অবাস্তব ব্যাপার।

৭। যেয়ো না—এর উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্মাণ করো?

উঃ এখানে উদ্দেশ্য হলো (তুমি), আর বিধেয় হলো যেয়ো না।

৮। অবাস্তব ভাব প্রকাশক শব্দ কি বাক্য?

উঃ না, অবাস্তব ভাব প্রকাশক শব্দ বাক্য নয়।

৯। শব্দ গঠন করতে হলে কি করতে হবে?

উঃ শব্দ গঠনের জন্য ধ্বনিগুলির একটি অর্থ থাকতে হবে।

১০।উদ্দেশ্য কি বাক্যে থাকতেই হবে?

উঃ না। অনেক সময় উদ্দেশ্য উহ্য থাকে। যেমন—এখানে এসো।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরেরর পাশে () চিহ্ন দাও :

(ক) 'ই' একটি ☐ হ্রস্বস্বর ☐ দীর্ঘস্বর।

(খ) ধ্বনির লিখিত রূপ হলো ☐ বর্ণ ☐ শব্দ ☐ পদ।

(গ) 'ট' বর্গটি ☐ দন্ত্যবর্ণের ☐ মূর্ধণ্যবর্ণের ☐ কণ্ঠ্যবর্ণের অর্ন্তগত।

(ঘ) বাংলা বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা ☐ ৩০ ☐ ৫১ ☐ ৪০।

(ঙ) শ, ষ, কে ☐ শিস ধ্বনি ☐ উষ্ম বর্ণ ☐ অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

২। ঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

(ক) যুক্ত স্বর বলা হয়

(i) উ এবং ঊ কে

(ii) ই এবং ঈ কে

(iii) ঐ এবং ঔ কে

(খ) প ফ ব ভ ম যে বর্গের অন্তর্গত তাহলো

(i) ক-বর্গ

(ii) প-বর্গ

(iii) ত-বর্গ

(গ) অনুনাসিক বর্ণ বলা হয়

(i) ং এবং ঃ কে

(ii) ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কে

(iii) ক, খ, গ, ঘ, ঙ, কে

(ঘ) 'র' কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসলে

(i) র-ফলা হয়

(ii) রেফ হয়।

(ঙ) অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়

(i) য র ল ব কে

(ii) প ফ ব ভ কে

(iii) শ, ষ, স কে

(চ) স্পর্শ বর্ণ বলা হয়

(i) ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি বর্ণকে

(ii) ক থেকে ঙ পর্যন্ত ৫টি বর্ণকে

(iii) চ থেকে ঞ পর্যন্ত ৫টি বর্ণকে।

(ছ) ব্যঞ্জনবর্ণ গুলি কে

(i) ৪ বর্গে ভাগ করা যায়

(ii) ৫ বর্গে ভাগ করা যায়

(iii) ৬ বর্গে ভাগ করা যায়

(জ) স্পর্শ বর্ণগুলিকে ভাগ করা যায়

(i) পাঁচটি বর্গে

(ii) ৪ টি বর্গে

(iii) ৬ টি বর্গে

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলিকে বলা হয় ———— বর্ণ।

(খ) য, র, ল, ব কে বলা হয় ———— বর্ণ।

(গ)অনুনাসিক বর্ণ বলা হয় ———— কে।

(ঘ) কার-গুলির প্রত্যেকটির আলাদা ————আছে।

(ঙ) কোন ব্যঞ্জনের আগে 'র' বসলে তা ———— হয়ে যায়।

৪। **দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) কোন ধ্বনিগুলিকে শিস্‌ধ্বনি বলা হয়?

(খ) অনুনাসিক বর্ণ কোনগুলি?

(গ) ক থেকে খ পর্যন্ত বর্ণগুলিকে কি বলে?

(ঘ) দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে তৈরি একটি যুক্তাক্ষর লেখ।

(ঙ) কোন ব্যঞ্জনের আগে 'র' বসলে তা ———— হয়ে যায়।

৪। **দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) কোন ধ্বনিগুলিকে শিস্‌ধ্বনি বলা হয়?

(খ) অনুনাসিক বর্ণ কোনগুলি?

(গ) ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলিকে কি বলে?

(ঘ) দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে তৈরি একটি যুক্তাক্ষর লেখো।

(ঙ) তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে তৈরি একটি যুক্তাক্ষর লেখো।

৫। **কাকে বলে এবং উদাহরণ দাও :**

শিস ধ্বনি, অন্তঃস্থবর্ণ, স্পর্শ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ ও তালব্য বর্ণ।

৬। **কোনটি কি বর্ণ বল :**

ং এবং ঃ, শ, হ, স য, ঞ, ণ, ন, ঙ, প, ক, র, ত, য।

৭। **কোন কোন বর্ণের মিলনে তৈরি হয়েছে বল**

ঙ্ক, ঞ্চ, ক্ষ, ত্র, স্য।

৮। **ঠিক না ভুল বল :**

(ক) স্পর্শবর্ণগুলিকে ৫ টি বর্গে ভাগ করা হয়। ☐

(খ) প্রতিটি বর্গে ৫টি করে বর্ণ থাকে। ☐

(গ) বাংলা বর্ণ মালায় মোট ৪৬ টি বর্ণ আছে। ☐

(ঘ) ং এবং ঃ কে অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। ☐

(ঙ) ধ্বনির লিখিত রূপ হলো বর্ণ। ☐

(চ) 'ড়' বর্ণটি 'ড' এর অন্য রূপ। ☐

(ছ) ৎ বর্ণটি ত এর অন্য রূপ। ☐

(জ) অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণে নাসিকার প্রয়োজন হয়। ☐

(ঝ) স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ সাধনকে বলা হয় বানান। ☐

(ঞ) ँ বিন্দু সানুনাসিক বর্ণ বলে। ☐

বর্ণ বিশ্লেষণ

ধ্বনির সঙ্গে বর্ণ যোগ করে বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগ করে অথবা কখনো-কখনো একটি ধ্বনি বা বর্ণ গড়ে তোলাযায়। তাই যখন একই শব্দে একাধিক বর্ণ বা ধ্বনি থাকে তখন তাদের আলাদা করে ভেঙে ভেঙে দেখানো যায়। এইভাবে শব্দে ব্যবহৃত ধ্বনি বা বর্ণগুলিকে পৃথক করে দেখানোকে বর্ণ বিশ্লেষণ বলে।

নীচে কতকগুলি শব্দ বর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো হল :

শব্দ	বর্ণ বিশ্লেষণ	শব্দ	বর্ণবিশ্লেষণ
কাক	ক্ + আ+ ক্+ অ।	জীবন	জ্ + ঈ + ব্ + অ+ ন্+ অ।
বক	ব্ + অ+ ক্+ অ।	কুঁড়ি	ক্ + ঁ + উ + ড়্ + ই।
দাদা	দ্ + আ + দ্ + আ।	রমেশ	র্ + অ + ম্ + এ+ শ্ + অ।
কাকা	ক্ + আ + ক্+ আ।	সততা	স্ + অ + ত্ + অ + ত্ + আ।
ঘর	ঘ্ + অ + র্ + অ।	মৃত্যু	ম্ + ঋ + ত্ + য্ + উ।
বাড়ি	ব্ + আ + ড়্ + ই।	লিখিত	ল্ + ই+ খ্+ ই+ ত্+ অ।
পথ	প্ + অ+ থ্+ অ।	ঊর্ধ্বে	ঊ + র্ + ধ্ + ব্ + এ।
বই	ব্ + অ + ই	পৃথিবী	প্ + ঋ + থ্ + ই + ব্ + ঈ
কলম	ক্ + অ+ ল্+ অ + ম্+ অ।	স্বাস্থ্য	স্ + ব্+ আ+ স্+ থ্+ য্+ অ।
কাঁচা	ক্ + ঁ + আ+ চ্+ আ।	জ্যৈষ্ঠ	জ্ + য্+ ঐ+ ষ্+ ঠ্+ অ।
ছুটি	ছ্ + উ + ট্ + ই।	ক্রুর	ক্ + র্+ উ+ র্ + অ।
হাতে	হ্ + আ+ ত্ + এ।	পল্বল	প্ + অ+ ল্+ ব্+ অ + ল্ + অ।
মেয়ে	ম্ + এ+ য়্+ এ।	সুষ্ঠু	স্ + উ+ ষ্+ ঠ্+ উ।
বৃষ্টি	ব্ + ঋ+ ষ্+ ট্+ ই।	ইস্কুল	ই + স্+ ক্ + উ+ ল্+ অ।
শব্দ	শ্ + অ+ ব্ + দ্+ অ।	মধ্যাহ্ন	ম্ + অ + ধ্+ য্ + আ+ হ্ + ন্ + অ।

বাড়িতে ব্ + আ+ ড়্+ ই+ ত্+ এ।

কোলে ক্ + ও + ল্ + এ।

সমান স্ + অ+ ম্+ আ + ন্ + অ।

অনেক অ + ন্ + এ + ক্ + অ।

ঝরনা ঝ্ + অ + র্ + অ+ ন্ + আ।

পবিত্র প্ + অ + ব্+ ই+ ত্ + র্ + অ।

ফুল ফ্ + উ+ ল্+ অ।

বালিকা ব্ + আ+ ল্+ ই+ ক্+ আ।

চঞ্চল চ্ + অ + ঞ্+ চ্+ অ+ ল্+ অ।

শত্রুতা শ্ + অ + ত্ + র্ + উ + ত্ + আ।

বোন ব্ + ও + ন্ + অ।

নৌকা ন্ + ঔ + ক্ + আ।

প্রকৃত প্ + র্ + অ + ক্ + ঋ + ত্ + অ

গদ্য গ্ + অ + দ্ + য্ + অ।

পদ্য প্ + অ + দ্ + য্ + অ।

আঠারো আ + ঠ্ + আ + র্ + ও।

মাধ্যম ম্ + আ + ধ্ + য্ + অ + ম্ + অ।

রাষ্ট্র র্ + আ + ষ্ + ট্ + র্ + অ।

নিজস্ব ন্ + ই + জ্ + অ + স্ + ব্ + অ

নিশ্বাস ন্ + ই + শ্ + ব্ + আ + স্ + অ।

পুষ্প প্ + উ + ষ্ + প্ + অ।

শংকর শ্ + অ + ং+ ক্ + আ + র্ + অ।

নিস্তেজ ন্ + ই + স্ + এ + জ্ + অ।

জোনাকি জ্ + ও + ন্ + আ + ক্ + ই।

কিংবা ক্ + ই + ং + ব্ + আ।

আস্তানায় আ + স্ + ত্ + আ + ন্ + আ + য়্ + অ

ইচ্ছে ই + চ্ + ছ্ + এ

শ্রীমান্ শ্ + র্ + ঈ + ম্ + আ + ন্।

দৌড়ে দ্ + ঔ + ড়্ + এ।

লক্ষ্য ল্ + অ + ক্ + ষ্ + য্ + অ।

নিশ্চিন্ত ন্ + ই + শ্ + চ্ + ই + ন্ + ত্ + অ।

চাণক্য চ্ + আ + ণ্+ অ + ক্+ য্ + অ।

শাস্তি শ + আ+ স্ + ত্ + ই।

আত্মীয় আ + ত্ + ম্+ ঈ+ য়্+ অ।

ঘোষক ঘ্ + ও+ ষ্+ অ+ ক্+ অ।

জৈন জ্ + ঐ + ন্+ অ।

তীর্থ ত্ + ঈ+ থ্ + র্ + অ।

পুরানো প্ + উ + র্ + আ + ন্ + ও।

দ্বীপ দ্ + ব্ + ঈ + প্ + অ।

পূর্ব প্ + ঊ + র্ + ব্ + অ।

প্রিয় প্ + র্ + ই + য়্ + অ।

স্পষ্ট স্ + প্ + অ + ষ্ + ট্ + অ।

কবিতা ক্ + অ + ব্ + ই + ত্ + আ।

স্থির স্ + থ্ + ই + র্ + অ।

ব্যাকরণ ব্ + য্ + আ+ ক্ + অ + র্ + অ + ণ + অ।

প্রবন্ধ প্ + র্ + অ + ব্ + অ + ন্ + ধ্ + অ।

স্পর্শ স্ + প্ + অ + শ্ + র্ + অ।

পৈতৃক প্ + ঐ + ত্ + ঋ+ অ + ক্ + অ।

ভ্রমর ভ্ + র্ + অ + ম্ + অ + র্ + অ।

নির্ভর ন্ + ই + র্ + ভ্ + অ + র্ + অ।

শূন্য শ্ + উ + ন্ + য্ + অ।

জ্বলছে জ্ + ব্ + অ + ল্ + অ + ছ্ + এ।

বিদ্যুৎ ব্ + ই + দ্ + য্ + উ + ত্।

মিশিয়ে ম্ + ই + শ্ + ই + য়্ + এ।

পশ্চিম প্ + অ + শ্ + চ্ + ই + ম্ + অ।

নম্র ন্ + অ + ম্ + র্ + অ।

অনুশীলনী

১। বর্ণ বিশ্লেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। বর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখাও?

অতি, মনোরম, হদিস্, সীমানা, কলশ, মাছ, মাতা, মৃত্যু, দাবা, মাঠে, বাইরে, সবুজ, হলুদ, মিথ্যা, সত্যি, জোর, বৃষ্টি, সাগর, রাস্তা, লেখা, খাওয়া, ঘুমানো, ওঠা, জীবন, মরণ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো :

স্ + ও + ফ্ + আ = ______ ।

ক্ + অ + ল্ ______ + ম্ + অ = কলম।

ঘ্ + অ + ড়্ ______ = ঘড়ি।

জ্ + ও + র্ + আ + ল্ + ______ = জোরালো।

ট্ + এ + ব্ + ই + ল্ + অ = ______ ।

প্ + উ + র্ + ব্ + অ = ______ ।

৪। ঠিক না ভুল বলো :

বাসনা — ব্ + আ + স্ + ন + ন্ + অ। ☐

বারিদ — ব্ + আ + র্ + ই + দ ☐

পুরানো — প্ + উ + র্ + আ + ন্ + ও ☐

কোকিল — ক্ + ও + ক + ই + ল + অ ☐

প্রকৃত — প্ + র্ + অ + ক্ + ঋ + ত্ + অ ☐

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ-পদ-বাক্য

শব্দ কাকে বলে? আমরা মুখ দিয়ে নানারকম ধ্বনি বা আওয়াজ করি। অনেক ধ্বনি

অনেক গুলি ধ্বনি পর পর বসে তৈরি হয় শব্দ। ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ + অ এই ছটি ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়েছে। অনেক অনেক দিয়েই শব্দ গঠিত হয়। যেমন 'কলম' শব্দটি ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ + অ এই ছটি ধ্বনি দিয়ে বাতাস শব্দটি তৈরি হয়েছে। 'আকাশ' শব্দটি আ + ক্ + শব্দটি—ব্ + আ + ত্ + আ + স্ + অ—এই ছটি ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়েছে। ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ + অ এই ছটি ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে কলম, আকাশ ও বোতল বললে আমাদের মনে বিশেষ বিশেষ জিনিসের কথা ভেসে ওঠে। এক প্রত্যেকটিরই একটি করে অর্থ আছে। তাই বলতে পারি অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি হলো শব্দ।

শুধু মাত্র অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিই শব্দ। অর্থ না বোঝালে ধ্বনি সমষ্টি শব্দ হবে না। যেমন ল্ + ত্ + ব্ + অ + ল্ + অ কিংবা ব্ + ল্ + ত্ + ও + ব্ + অ + আ— 'বলোতা' ছটি ধ্বনি থাকলেও শব্দ নয়। কারণ এটির কোন অর্থ হয় না। যেমন ব্ + ও + ত্ + অ + ল্ + অ— এ বোতল বা বলতো শব্দ নয়। কিন্তু ঐ তিনটি ঘুরিয়ে দিলেই শব্দ হবে। যে সব ধ্বনি সমষ্টির অর্থ নেই,

তাই আমরা বলতে পারি শব্দ গঠনের জন্য ধ্বনি সমষ্টির একটি অর্থ থাকতেই হবে। আর বর্ণ পাশাপাশি বসে শব্দ তারা শব্দ নয়। আমরা মুখ দিয়ে বিশেষ ধ্বনি ব্যবহার করি। ধ্বনির লিখিত রূপ হলো বর্ণ। ভাব বা অর্থ প্রকাশ করতে হয় শব্দ।

আবার বাক্যে কতগুলি অর্থ পূর্ণ শব্দকে পাশাপাশি বসিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। বাক্যে ব্যবহৃত এইটি শব্দই হলো পদ।

বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে। তাই সংস্কৃত বহু শব্দ সরাসরি বাংলায় চলে এসেছে। আবার কিছু শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে। আবার কিছু বিদেশী শব্দ অন্য ভাষায় এসেছে। সেই সঙ্গে কিছু দেশী শব্দ ও বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। তাই বাংলা শব্দকে মোটামুটি ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ (২) তদ্ভব শব্দ (৩) অর্ধতৎসম শব্দ (৪) দেশী শব্দ (৫) বিদেশী শব্দ। কতগুলি কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসালেই বাক্য হবে না। পাশাপাশি বসে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। যেমন—

(ক) আপন আজ কাজে হবে চলবে না

—আপন কাজে আজ হবে চলবে না।

(খ) ফুলের চেহারা মতন যেমন তোর অতি নির্বোধ

—ফুলের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি তোর।

(গ) ঈশ্বরচন্দ্রের ভগবতী দেবী মায়ের নাম

—ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের নাম ভগবতী দেবী।

(ঘ) কলকাতা রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর জন্মগ্রহণ ঠাকুর পরিবারে

—রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঙ) চলি যেন আমি ভালো হয়ে সারাদিন

—সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।

তবে বাক্য গঠনের সময় তিনটি শর্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে। সেগুলি হল—

- (ক) বাক্যের মধ্যে মনের ভাবটি যেন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।
- (খ) কোনো অর্থ হয় না এমন অসংগত শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন করা যাবে না।
- (গ) যে শব্দটির পাশে যে শব্দটিকে বসালে বাক্যের অর্থ খুব সহজেই বোঝা যাবে, ঠিক তেমন ভাবেই শব্দগুলিকে বাক্যের মধ্যে সাজিয়ে বসাতে হবে।

নীচে একটি ছকে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে। এদের মধ্যে কোন্‌টি বাক্য এবং কোন্‌টি বাক্য নয় তা তোমাদের বলতে হবে।

ছক নং (১) বাক্য নয়	কেন বাক্য নয়
১। গোরু ঘাস	১। কারণ মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি
২। ছাগলটি গাছের ডালে চড়ছে	২। এটিও বাক্য নয়। কারণ ছাগলের পক্ষে গাছের ডালে চড়া অসম্ভব
৩। দিয়ে আমি হাত করি কাজ	৩। এটিও বাক্য নয়। কারণ শব্দগুলি পাশাপাশি বসলেও অর্থ বোঝা যায়নি।।

ছক নং (২) বাক্য	কেন বাক্য?
১। মধুমিতা গান করে। অথবা গোরু ঘাস খায়।	১। মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দুটিই বাক্য।
২। বানরেরা গাছের ডালে চড়ে বেড়াচ্ছে। বা বানরেরা গাছের ডালে লাফালাফি করছে।	২। এটি বাক্য। কারণ বানরদের গাছের ডালে বসে থাকা সংগত। অতএব এটি বাক্য।
৩। আমি হাত দিয়ে কাজ করি।	৩। এটিও একটি বাক্য। কারণ ঠিকভাবে সাজিয়ে বসানোয় মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

বাক্যের দুটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যার সম্পর্কে কিছু বলা যায় বা হয় তাকে **উদ্দেশ্য** বলে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে **বিধেয়** বলে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে তোমাদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা যায়।

উদ্দেশ্য	বিধেয়
মধুপর্ণা	বাড়িতে পড়া তৈরি করছে।
পাখিটা	গাছের ডালে বসে আছে।
ঘোড়াটি	খুব জোরে দৌড়াচ্ছে।
মাঝি	নৌকা করে মাছ ধরছে।

শিক্ষকমশাই	ক্লাসে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
সূর্য	প্রত্যহ সকালে পূর্বদিকে ওঠে।
লোপামুদ্রা	পড়াশোনায় বেশ ভালো।
সোহম	ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।
অমিতাভ	শিক্ষকতা করে।

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ করলে সহজেই বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি অংশ আছে একটি **উদ্দেশ্য**, অপরটি **বিধেয়**। মধুপর্ণা বাড়িতে পড়া তৈরি করছে, বাক্যটিতে মধুপর্ণা উদ্দেশ্য এবং পড়া তৈরি করছে বিধেয়। কারণ মধুপর্ণা কী করছে প্রশ্ন করলে উত্তর পাই মধুপর্ণা পড়া তৈরি করছে। সুতরাং মধুপর্ণা উদ্দেশ্য এবং পড়া তৈরি করছে বিধেয়।

আবার অপর একটি বাক্যে ঘোড়াটি খুব জোরে দৌড়ায়। দেখতে পাই ঘোড়াটি উদ্দেশ্য এবং খুব জোরে দৌড়ায় **বিধেয়**। সুতরাং বলা যায় যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে **উদ্দেশ্য** এবং **উদ্দেশ্য** সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে **বিধেয়** বলে।

বাক্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়

বাক্য

সরল বাক্য | **জটিল বাক্য** | **যৌগিক বাক্য**

সরল বাক্য = সে দরিদ্র হলেও সৎ।

জটিল বাক্য = যদিও সে দরিদ্র তবুও সে সৎ।

যৌগিক বাক্য = সে দরিদ্র কিন্তু সৎ।

এছাড়াও অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন নির্দেশসূচক, অনুজ্ঞাসূচক, ইচ্ছাবোধক, বিস্ময়বোধক প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। বাক্য কাকে বলে? বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

২। **শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্য গঠন করো**

(i) সে বাড়ি ————।　　(ii) রমা বই ————।

(iii) মা রান্না————।　　(iv) বাবা বাজারে ————।

(v) ডাক্তার রোগী ————।　　(vi) ছেলেরা মাঠে ফুটবল ————।

(vii) তোমার ———— থেকে আসা হচ্ছে?

৩। নীচে যেটি বাক্য তার পাশে (✓) চিহ্ন দাও আর যেটি বাক্য নয় তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও।

(i) তিনি স্থির হয়ে। ☐ (ii) সে যাত্রা বাঁচলাম। ☐

(iii) মা ছেলেকে ভাত। ☐ (iv) ছেলেরা বই পড়ছে। ☐

(v) বিড়ালটা মিউ মিউ করছে। ☐

৪। নীচের শব্দগুলিকে ঠিক করে সাজিয়ে শুদ্ধ বাক্য গঠন করো :

(i) সে খায় ভাত।

(ii) সেদিন বাড়ি আমি গিয়ে ঘুমালাম।

(iii) হাতিগুলো গাছের ডালে লাফালাফি করছে।

(iv) পড়তে বই ভালো আমার না লাগে।

(v) কুকুরগুলো মেও মেও করছে।

৬। ছবি দেখে ঠিকমতো বিধেয় বসাও :

মিতা.......... ছেলেরা.................. ব্রাহ্মণ.................. আকাশে..................

৭। বাক্যের কটি অংশ ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৮। বাঁদিকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে ডানদিকে বিধেয় বসাও :

উদ্দেশ্য বিধেয়

(i) মিতা ....

(ii) শিক্ষকমশাই ....

(iii) ব্রাহ্মণ ....

(iv) মা ....

(v) ছেলেরা ....

৯। ঠিক না ভুল বলো :

(ক) সে জোরে— বাক্য / বাক্য নয়।

(খ) যদু খায় — বাক্য / বাক্য নয়।

(গ) মধু রোজ বিদ্যালয়ে— বাক্য / বাক্য নয়।

(ঘ) মিথ্যা কথা বল না—বাক্য / বাক্য নয়।

(ঙ) সকালে ওঠা—বাক্য / বাক্য নয়।

(চ) যাও—বাক্য / বাক্য নয়।

(ছ) গাড়ি ভাল— বাক্য / বাক্য নয়।

১০। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বাক্যের কটি অংশ ও কি কি?

(খ) ধ্বনির লিখিত রূপকে কি বলে?

(গ) অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিকে কি বলা হয়?

(ঘ) পদ ছাড়া কি বাক্য গঠিত হয়?

(ঙ) আকাশে মাছ উড়ে বেড়ায়—বাক্য নয় কেন?

নবম অধ্যায়

লিঙ্গ-পুরুষ-স্ত্রী-ক্লীব লিঙ্গ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ— লক্ষণ বা চিহ্ন। যে লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা কোনটি কি প্রাণী বা বস্তু পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব কিনা, তাকেই বলা হয় লিঙ্গ। কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম পদেরই লিঙ্গ হয়।

লিঙ্গের শ্রেণিবিভাগ

লিঙ্গাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(ক) পুংলিঙ্গ

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ

(গ) ক্লীব লিঙ্গ। এছাড়া আর এক জাতীয় লিঙ্গের কথা বলা হয়ে থাকে। তা হলো **উভয় লিঙ্গ**।

(ক) **পুংলিঙ্গ :** প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বোঝায়, তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন নর, হরিণ, মোরগ, গোলাম, রাজা, জামাই, বর, ষাঁড়, জনক, গায়ক প্রভৃতি।

(খ) প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা স্ত্রী জাতিকে বোঝায়, তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন নারী, হরিনী, মুরগি, বাঁদি, রাণী, মেয়ে, কনে, গাই, জননী, গায়িকা প্রভৃতি।

(গ) **ক্লীবলিঙ্গ :** অপ্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কাউকেই বোঝায় না, তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন কলম, খড়ি, গাছ, টেবিল, চেয়ার, বই প্রভৃতি।

উভয় লিঙ্গ : প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই বোঝায়, তাকেই উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন শিশু, পাখি, বাছুর, সন্তান প্রভৃতি।

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ বোধক বা স্ত্রী লিঙ্গ বোধক কোনো শব্দকে বিপরীত লিঙ্গে পরিবর্তন করা হয়।

লিঙ্গ পরিবর্তনের কতকগুলি নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলিকে মেনেই বাংলায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

(ক) সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ দিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	জনক	জননী
স্বামী	স্ত্রী	ছেলে	মেয়ে
ছেলে	মেয়ে	পুত্র	কন্যা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বর	কনে/বউ	সাহেব	মেম
বাদশা	বেগম	পিতা	মাতা
কর্তা	গিন্নি	এঁড়ে	বকনা
বাপ	মা	ভদ্রলোক	ভদ্রমহিলা
দেওর	জা	খানসামা	আয়া
ঠাকুরদা	ঠাকুরমা	বিপত্নীক	বিধবা
ভাসুর	ননদ/জা	ভূত	পেত্নী
দাদামশাই	দিদিমা	মিঞা	বিবি
দাদা	দিদি	মিস্টার	মিসেস
ভাগনে	ভাগনি	নর	নারী
শ্যালক	শ্যালিকা/শালি	যুবক	যুবতী
পুরুষ	নারী	চাকর	ঝি
		লর্ড	লেডি

(খ) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনাথ	অনাথা	শিষ্য	শিষ্যা	বৎস	বৎসা
সদয়	সদয়া	নন্দন	নন্দনা	কৃশ	কৃশা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	অশ্ব	অশ্বা	প্রিয়	প্রিয়া
মৃত	মৃতা	তনয়	তনয়া	চঞ্চল	চঞ্চলা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	প্রথম	প্রথমা	প্রবীণ	প্রবীণা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	মুগ্ধ	মুগ্ধা	সদস্য	সদস্যা
মহাশয়	মহাশয়া	পলাতক	পলাতকা	মাননীয়	মাননীয়া
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠা	লুব্ধ	লুব্ধা	শারদীয়	শারদীয়া
পূজনীয়	পূজানীয়া	মনোহর	মনোহরা	স্মরণীয়	স্মরণীয়া
বরণীয়	বরণীয়া	আদ্য	আদ্যা।		

(গ) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ঈ যোগ করে লিঙ্গ করা হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুত্র	পুত্রী	কর্তা	কর্ত্রী	আত্রেয়	আত্রেয়ী
ছাত্র	ছাত্রী	নেতা	নেত্রী	সবিতা	সবিত্রি
গৌর	গৌরী	ধাত্র	ধাত্রী	শ্রোতা	শ্রোত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নিশাচর	নিশাচরী	প্রণেতা	প্রণেত্রী	রাজা	রাজ্ঞী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী	শাস্ত্র	শাস্ত্রী	বিদ্বান	বিদুষী
তাপস	তাপসী	ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
তরুণ	তরুণী	রূপবান	রূপবতী	সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিকী
কাকা	কাকী	গুণবান	গুণবতী	পঞ্চদশ	পঞ্চদশী
চকোর	চকোরি	সিংহ	সিংহী	সৎ	সতী
মহান	মহতী				

(ঘ) যে সমস্ত শব্দের শেষে অক বা ইক থাকে তাদের শেষে আ বা ইকা প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ পদ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	বালক	বালিকা	পাঠক	পাঠিকা
বাহক	বাহিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
পাচক	পাচিকা	প্রাপক	প্রাপিকা	শ্যালক	শ্যালিকা
নায়ক	নায়িকা	যাজক	যাজিকা	চালক	চালিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	প্রকাশক	প্রকাশিকা	সাধক	সাধিকা
অভিভাবক	অভিভাবিক	গায়ক	গায়িকা	লেখক	লেখিকা

(ঙ) অনেক পুংলিঙ্গ শেষে আনী আনি প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বরুণ	বরুনানী	ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী
রুদ্র	রুদ্রানী	ঠাকুর	ঠাকুরানী
শর্ব	শর্বানী	নাপিত	নাপিতানি
মাতুল	মাতুলানি	আচার্য	আচার্যানি
ভব	ভবানি	চৌধুরী	চৌধুরানি
শিব	শিবানি	শূদ্র	শূদ্রানি

(চ) অনেক পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ইনী ইনি প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনী	গোয়ালা	গোয়ালিনী	অভাগা	অভাগিনি
মায়াবী	মায়াবিনী	কাঙাল	কাঙালিনী	রোগী	রোগিনী

হরিণ	হরিণী	পুত্রী	পুত্রিনী	পাগল	পাগলিনী
পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
ধনী	ধনিনী	অভিমানি	অভিমানিনী	নিতম্ব	নিতম্বিনী
নাগ	নাগিনী	হস্তী	হস্তিনী	ঠাকুর	ঠাকুরানি
বিদেশি	বিদেশিনি	তপস্বী	তপস্বিনী	মাস্টার	মাস্টারনি
সাপ	সাপিনী	ভিখারি	ভিখারিনি		

(ছ) অনেক সময় পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
লোক	স্ত্রীলোক	ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	পুরুষযাত্রী	মহিলাযাত্রী
গোসাই	মাগোসাই	পুলিশ	মহিলাপুলিশ	প্রতিনিধি	মহিলাপ্রতিনিধি
হাতি	মাদি হাতি	মৌমাছি	স্ত্রীমৌমাছি	মদ্দাউট	মাদিউট
কবি	মহিলাকবি	বোলতা	স্ত্রীবোলতা	পুত্রসন্তান	কন্যাসন্তান
বসু	বসুজায়া	বামুন	বামুনগিন্নি	পুরুষবন্ধু	মহিলাবন্ধু/ মেয়েবন্ধু
শিশুপুত্র	শিশুকন্যা	মদ্দাবিল	মাদিবিল		
ডাক্তার	ডাক্তারগিন্নি	হুলোবিড়াল	মেনিবিড়াল	মদ্দা হাঁস	মাদিহাঁস
বেনে	বেনে বউ	এঁড়ে বাছুর	বকনাবাছুর		

(জ) কিছু উভয় লিঙ্গ শব্দের আগে পুরুষ বাচক কিংবা স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়েও লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায়।

উভয়লিঙ্গ	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মানুষ	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ
বন্ধু	পুরুষ বন্ধু	মেয়ে বন্ধু
সৈন্য	পুরুষ সৈন্য	নারী সৈন্য
সন্তান	পুত্র সন্তান	কন্যা সন্তান
যাত্রী	পুরুষ যাত্রী	মহিলা যাত্রী
প্রতিনিধি	পুরুষ প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
হাতি	মদ্দা হাতি	মাদি হাতি
বিড়াল	হুলোবিড়াল	মেনিবিড়াল

লিঙ্গ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর :

১। লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ লিঙ্গ প্রধানত তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এছাড়াও উভয়লিঙ্গবোধক০ কিছু শব্দ আছে।

২। উভয় লিঙ্গবাচক পাঁচটি শব্দ লেখো :

উঃ মানুষ, সন্তান, বন্ধু, সৈন্য, যাত্রী।

৩। সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়েছে, এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও।

উঃ কর্তা—গিন্নি। জনক—জননী। বাদশা—বেগম। ভূত—পেত্নি। সাহেব—বিবি।

৪। সর্বদাই স্ত্রী লিঙ্গ হয়, এমন তিনটি শব্দ লেখো।

উঃ সধবা, বিধবা, লক্ষ্মী। এদের নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও বলে। এছাড়া সজনি, ধাই, সতিন, বাঁজা প্রভৃতি শব্দও নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।

৫। সর্বদাই পুংলিঙ্গ এমন তিনটি শব্দ লেখো।

উঃ সভাপতি, বিপত্নীক, অকৃতদার, সৈন্য, কাপুরুষ, কবিরাজ।

৬। ক্লীব লিঙ্গ হয় এমন কতকগুলি সর্বনামের নাম লেখ।

উঃ তা, যা, যেসব, সেসব, যেগুলি, সেগুলি, ওটা, সেটা প্রভৃতি।

৭। দুটি সর্বনাম পদের উল্লেখ কর যেগুলি দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বোঝায়?

উঃ সে ও তিনি।

৮। কোন কোন পদের লিঙ্গান্তর হয়?

উঃ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের।

৯। সম্পূর্ণ ভিন্নশব্দে যোগে লিঙ্গান্তর করা তিনটি শব্দ লেখো।

উঃ ভাসুর—ননদ। দেওর—জা। বিপত্নীক—বিধবা। বাদশা —বেগম। ষাঁড় — গাই।

১০। ক্লীবলিঙ্গ বাচক শব্দ লেখ :

উঃ কলম, বাড়ি, গাছ, টেবিল, চেয়ার।

১১। ভারত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, না ক্লীব লিঙ্গ

উঃ দেশমাতা হিসাবে ভারত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

(ক) যে সব শব্দের শেষে 'অক' থাকে লিঙ্গান্তরে সেখানে

(i) ঈনি যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়ে থাকে। ☐

(ii) 'ইকা' যোগে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়ে থাকে। ☐

(iii) ভিন্ন শব্দ বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে। ☐

(খ) ভারত একটি দেশ বাচক শব্দ। কিন্তু সেটি

(i) পুংলিঙ্গ ☐ (ii) স্ত্রীলিঙ্গ ☐ (iii) ক্লীবলিঙ্গ ☐

(গ) প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বোঝায় তা

(i) ক্লীবলিঙ্গ ☐ (ii) স্ত্রী লিঙ্গ ☐ (iii) পুংলিঙ্গ ☐

(ঘ) উভয় লিঙ্গ শব্দগুলির দ্বারা বোঝায়

(i) পুরুষ জাতিকে ☐ (ii) স্ত্রী জাতিকে ☐ (iii) স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে। ☐

(ঙ) যে সমস্ত পদের লিঙ্গান্তর হয়ে তা হলো

(i) অব্যয় ☐ (ii) বিশেষণ ☐ (iii) বিশেষ্য ও সর্বনাম ☐

২। **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(i) কেবলমাত্র ———— ও ———— পদের লিঙ্গান্তর হয়।

(ii) প্রাণীবাচক ———— পদের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বোঝায় তাকে ———— বলে।

(iii) উত্তম পুরুষের সর্বনাম পদের ———— হয় না।

(iv) বিধবা শব্দটি নিত্য————। তবে তার বিপরীত লিঙ্গ হিসাবে ———— শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(v) বিশেষ্য পদের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ কাউকেই বোঝায় না, তাকে ———— বলে।

৩। **সঠিক মন্তব্যের পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল মন্তব্যের পাশে (✗) চিহ্ন দাও :**

(i) অকৃতদার শব্দটি সর্বদাই পুংলিঙ্গ ☐

(ii) সজমি শব্দটি সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ ☐

(iii) উভয়লিঙ্গ শব্দগুলি প্রাণীবাচক হয়ে থাকে ☐

(iv) বিশেষণ পদেরও লিঙ্গ হয়ে থাকে। ☐

(v) বঙ্গ শব্দটিকে স্ত্রী লিঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। ☐

৪। **সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও :**

(i) সভাপতি শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ হলো সভানেত্রী। ☐

(ii) ক্লীবলিঙ্গ সাধারণত অপ্রাণীবাচক শব্দ হয়ে থাকে। ☐

(iii) বিশেষণ পদের লিঙ্গান্তর হয় না। ☐

(iv) মধ্যম পুরুষ পদের কোনো লিঙ্গাভেদ নেই। ☐

(v) বন্ধু শব্দটি উভয়লিঙ্গা বাচক শব্দ। ☐

৫। **দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) কোন কোন সর্বনাম পদের লিঙ্গ ভেদ নেই।

(খ) উভয় লিঙ্গ বোধক তিনটি শব্দ লেখ।

(গ) কোন কোন পদের লিঙ্গ হয়।

(ঘ) তিনটি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ লেখ।

(ঙ) তিনটি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ লেখ।

৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের দুটি নিয়মের উল্লেখ করে উদাহরণ দাও।

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন বলতে কি বোঝো?

৮। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কাদের বলা হয়।

৯। নিচের শব্দ মালার লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

সভ্য, নবাব, লেখিকা, বিড়াল, খানসামা, মহিলা, পুলিশ, সম্পাদক, দেওর, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ষাঁড়, বেদে, বাঁদি।

১০। নিচের শব্দগুলির কোনটি কি লিঙ্গ বল :

বিপত্নীক————

বন্ধু————

সধবা————

সৈন্য————

সারি————

ঠাকুরদা————

গোলাম————

মিঞা————

খানসামা————

সাহেব————

শ্যালক————